খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্যের বণ্টন

১৯৪৩ সালের মন্বন্তর। বিশ থেকে ত্রিশ লাখ মানুষ অনাহারে প্রাণ হারিয়েছিলেন। এ'বিষয়ে চর্চা কম হয়নি। আজও হয়ে চলেছে। স্যার জন উডহেডের নেতৃত্বে গঠিত ফেমিন এনকোয়ারি কমিশনের ১৯৪৫ সালের প্রতিবেদনে বলা হয় দুর্ভিক্ষের মূল কারণ ছিল খাদ্যশস্য উৎপাদনে ঘাটতি। ব্যাখ্যার এই ধারাটিকে বলা হয় ফুড অ্যাভেলেবিলিটি ডিক্লাইন (এফএডি)। জর্জ ব্লিন, পিটার বোব্রিক প্রমুখ অনেকে এই মত সমর্থন করেন, অনেকেই আবার করেন না। যারা করেন না তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি নাম নোবেলজয়ী অমর্ত্য কুমার সেন। অধ্যাপক সেনের বক্তব্য, দুর্ভিক্ষটি ছিল মানুষেরই কীর্তি। বিষম বন্টণ, মজুতদারি, কালোবাজারি ইত্যাদি কারণে দেশে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য থাকা সত্ত্বেও গরিব মানুষের কাছে তা পৌঁছয়নি। বিশ্লেষণের এই ধারাকে বলা হয় ফেলিওর অফ এক্সচেঞ্জ এনটাইট্‌লমেন্ট (এফইই)। আবার কেউ কেউ আছেন যেমন, অধ্যাপক তীর্থঙ্কর রায় প্রমুখ, যাঁরা মনে করেন দুটির মধ্যে কোনও একটিকে বিশেষ করে সমর্থন করা যায় না এবং অন্যটি সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাঁদের মতে, তৃতীয় একটি দৃষ্টিভঙ্গিও জরুরি। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে তথ্য, তথ্যের বিশ্লেষণ ও সেক্ষেত্রে বিশ্লেষণী প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম যা চল্লিশের দশক বা তার আগে উপলভ্য ছিল না। ফলে, রাষ্ট্রের পক্ষে ঠিক সময়ে ঠিক পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়নি।

কারণ যাই হোক, ১৯৪৩ এর আকাল কৃষিক্ষেত্রে সরকারি তৎপরতার সূচনা করে। ১৯৪৩ সালেই স্যার থিওডোর গ্রেগরির নেতৃত্বে গঠিত হয় ফুডগ্রেনস পলিসি কমিটি। ১৯৪৭ সালে আবার একটি ফুডগ্রেনস পলিসি কমিটি, এবার স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসের নেতৃত্বে। ১৯৫০ সালে থিরুমল রাওয়ের নেতৃত্বে ফুডগ্রেনস প্রকিওরমেন্ট কমিটি। ১৯৫৭ সালে অশোক মেহতার নেতৃত্বে ফুডগ্রেনস এনকোয়ারি কমিটি। ১৯৬৬ সালে ভেঙ্কটাপ্পাইয়ার নেতৃত্বে আবার একটি ফুডগ্রেনস পলিসি কমিটি। কমিটির শেষ নেই আজও। ১৯৭৫ সালে গঠিত হয় ন্যাশনাল কমিশন অন এগ্রিকালচার। ২০০০ এ ঘোষিত হয় ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল পলিসি। ২০০৭ এ ন্যাশনাল ফার্মার পলিসি। ২০১১ সালে ইন্টিগ্রেটেড এগ্রি-বিজনেস ডেভেলপমেন্ট পলিসি। এছাড়া, বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অঙ্গীভূত নীতিসমূহ এবং হালের নীতি আয়োগের নির্দেশাবলী তো আছেই। ভারতে যে কৃষিবিপ্লবের কথা বারংবার বলা হয়ে থাকে সেই সবুজ বিপ্লবের মূলে ছিল ১৯৫৯

সালে ভারত সরকারের খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রক এবং সমাজ উন্নয়ন ও সহযোগ মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সহায়তায় প্রস্তুত একটি প্রতিবেদন। প্রতিবেদনটির নাম "রিপোর্ট অন ইন্ডিয়াজ ফুড ক্রাইসিস অ্যান্ড স্টেপ্‌স টু মিট ইট"। তাতে ছিল অদূর ভবিষ্যতে ভারতের খাদ্য পরিস্থিতির ভয়ানক পূর্বাভাষ। এরপরই নরম্যান বোরলগ এবং রবার্ট গ্লেন অ্যান্ডারসন তাঁদের উচ্চ ফলনশীল গমের বীজ নিয়ে ভারতে এসে পড়লেন। তাঁদের সহায়তা করলেন বিশেষ করে, তৎকালীন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী সি সুব্রহ্মনিয়ম এবং ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর এম এস স্বামীনাথন। ১৯৬৫ সালে "নিউ স্ট্রাটেজি" নামে নতুন কৃষিনীতি যা কালে পরিচিতি পাবে সবুজ বিপ্লব নামে, যার অন্যতম আয়ুধ ছিল উচ্চ ফলনশীল বীজ, পুরোদমে চালু হয়ে গেল। ইতিমধ্যে ড্যানিয়েল থর্নার ১৯৫৯ সালেই বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে ইকনমিক উইকলি (পরে ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি) কাগজে "রিপোর্ট অন ইন্ডিয়াজ ফুড ক্রাইসিস অ্যান্ড স্টেপ্‌স টু মিট ইট" প্রতিবেদনটির জব্বর সমালোচনা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধটির নাম "প্লাউয়িং দ্য প্ল্যান আনডার ফোর্ড টিম রিপোর্ট অন ফুড ক্রাইসিস"। নামেই প্রকাশ, ফোর্ড ফাউন্ডেশনের প্রতিবেদনটির যাথার্থ্য এবং লক্ষ্য সম্পর্কে থর্নার সন্দিগ্ধ। একা থর্নার নন, পরবর্তীকালে অনেকেই যেমন, অধ্যাপক অশোক রুদ্র, অমিত ভাদুরি, কৃষ্ণা ভরদ্বাজ, উৎসা পট্টনায়ক প্রমুখ মোটামুটি একই মত প্রকাশ করেছেন তাঁদের লেখায় ও বক্তব্যে।

সেই ১৯৪৩ সাল থেকেই বিভিন্ন কমিটি, কমিশন, সরকারী প্রতিবেদন, ঘোষণাপত্র এবং নীতিসমূহ যে বিষয়গুলির উপরে জোর দিয়েছে তা মোটের উপর অভিন্ন। প্রায় সবগুলিই পুনরাবৃত্তি করেছে সেই ১৯৪৩ সালের স্যার থিওডোর গ্রেগরির নেতৃত্বে ফুডগ্রেনস পলিসি কমিটির সুপারিশগুলি – ১) খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি; ২) খাদ্যশস্যের দাম নিয়ন্ত্রণ; ৩) খাদ্যশস্যের যথেষ্ট পরিমাণ মজুত ভাণ্ডার বজায় রাখা। এই সুপারিশগুলি কার্যকর হওয়ার ফলে ভারতবর্ষে কৃষিনীতির রূপ দাঁড়িয়েছে – ১) বিদেশে গবেষণালব্ধ উচ্চ ফলনশীল বীজের প্রয়োগ; ২) কিছুকাল যাবত কিছু অঞ্চলে জেনেটিক্যালি মডিফায়েড শস্যবীজের প্রয়োগ; ৩) রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার; ৪) সেচের জলের ক্রমবর্ধমান চাহিদা; ৫) রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ইত্যাদির উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপুল সরকারি ভর্তুকি; ৬) কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রের বর্ধিত ব্যবহার; ৭) ফসলের ন্যূনতম দাম নির্ধারণ; ৮) ফসলের সরকারি ভাণ্ডার গঠন; ৯) সরকার পরিচালিত গণবন্টণ ব্যবস্থায় খাদ্যশস্যের বিক্রয়; ১০) ভারতবর্ষের নিজস্ব প্রজাতির খাদ্যশস্য বীজের অধিকাংশের বিলোপ।

ভিন্ন চিন্তাধারায় কৃষিনীতি চর্চাও করেছেন কেউ কেউ। সাম্প্রতিক কালে এই ধারায় অন্যতম উল্লেখযোগ্য ড রাজেন্দ্রনাথ বসুর নেতৃত্বে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট এগ্রিকালচারাল কমিশনের ফাইনাল রিপোর্ট ২০০৯ (প্রসঙ্গত, ২০০৯ সালেই পরলোক গমন করেন ১৯৭০ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী নরম্যান বোরলগ)। জাতিসংঘের উদ্যোগে ২০০৯ সালেই প্রকাশিত হয় "এগ্রিকালচার অ্যাট আ ক্রসরোডস – ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অফ এগ্রিকালচারাল নলেজ, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ফর ডেভেলপমেন্ট"। এই প্রতিবেদনে যা আছে তার সঙ্গে মোটের উপর মিলে যায় এই প্রতিবেদন প্রকাশের আগেই ২০০৮ সালে প্রকাশিত ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট এগ্রিকালচারাল কমিশনের অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন। একবিংশ শতকের এই চিন্তাধারার বিভিন্ন অংশ মিলে যায় বিংশ শতকের অশোক রুদ্র, উল্‌ফ লাডেজিন্‌স্কি, প্রণব বর্ধন, আর্থার ম্যাকইউয়ান, বাগিচা সিং মিনহাস প্রমুখের চিন্তাধারার সঙ্গে। এখানে একটা বিচিত্র বাস্তব উল্লেখ করা যেতে পারে। বাগিচা সিং মিনহাস ছিলেন মূলস্রোতের অর্থনৈতিক তাত্ত্বিক। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৩ অবধি ইন্ডিয়ান প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য ছিলেন। পাশাপাশি, ১৯৭২ থেকে ১৯৭৩ সালে ছিলেন ফিনান্স কমিশনের সদস্য। ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৮ যুক্ত ছিলেন বিশ্বব্যাংক ও ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গ্যানাইজেশনের সঙ্গে। গাণিতিক তাত্ত্বিক অর্থনীতির ধারায় কেনেথ অ্যারো এবং রবার্ট সোলোর সঙ্গে গবেষণাপত্র রচনা করেছেন। পদ্মভূষণও পেয়েছেন। সেই মিনহাস ১৯৭১ সালে বিশ্বব্যাংকের ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটে একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটি আদ্যোপান্ত প্রবন্ধ আকারে লিখিত হয়। কিন্তু, সেটি বিশ্বজনের দরবারে প্রকাশিত হওয়ার অনুমতি পায় না। থেকে যায় বিশ্বব্যাংকের সংরক্ষণাগারে ক্ল্যাসিফায়েড ডকুমেন্ট হিসাবে। প্রবন্ধটি ২০১২ সালে ডিক্ল্যাসিফাই ও ২০১৪ সালে ডিজিটাইজ করা হয়। প্রবন্ধটিতে মিনহাস তথ্য সহযোগে দেখাচ্ছেন, সবুজ বিপ্লবের ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদনবৃদ্ধির দাবিটি সত্য নয়। সবুজ বিপ্লবের পক্ষে প্রধান যুক্তিটি হল এর ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছিল। সেই ঘটনাও সত্য নয়! প্রায় এই একই বাস্তব উপস্থাপিত হয়েছে মূলস্রোতেরই অর্থনীতিবিদ ডি কে দেশাই, ডোরিস ব্রাউন প্রমুখের গবেষণায়। ইতিমধ্যে, বিশ্বের সমুদ্র ও মহাসমুদ্রে বহু নদ-নদীর জল মিশেছে, বহু ঝড়, বহু সুনামি বিশ্বকে উথালপাথাল করেছে। একবিংশ শতকে নিক কুলাথার, কোইচি ফুজিতা, রঞ্জিত সাউ, বারবারা হ্যারিস, বন্দনা শিবা প্রমুখ তীব্র সমালোচনা করেছেন তথাকথিত সবুজ বিপ্লবের। সমালোচনার মূল জায়গাগুলি হল – ১) সবুজ বিপ্লব ভারতের সর্বত্র সফল হয়নি; ২) সব শস্যের ক্ষেত্রেও সফল হয়নি; ৩) এমন কোনও প্রমাণ নেই যাতে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, উচ্চফলনশীল বীজ ও রাসায়নিক সার

প্রয়োগের ফলে ফলন সত্যি বেড়েছে এবং এসবের প্রয়োগ না ঘটলে কৃষি উৎপাদন বাড়ত না; ৪) তথাকথিত উচ্চ ফলনশীল বীজ ও রাসায়নিক সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেচের জল লাগে প্রচুর। এর ফলে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ে এবং ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডারে টান পড়ে; ৫) সবুজ বিপ্লবের ফলে আঞ্চলিক বৈষম্য বেড়েছে; ৬) একই অঞ্চলের কৃষিনির্ভর মানুষদের আয়ের বৈষম্য বেড়েছে; ৭) কৃষিশ্রমিকদের আয় কমেছে; ৮) যন্ত্রনির্ভর চাষাবাদের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষিকর্ম পুঁজিনিবিড় হয়ে উঠেছে এবং এর ফলে গ্রামীণ অঞ্চলে বেকারত্ব বেড়েছে; ৯) দীর্ঘকাল রাসায়নিক সার, কীটনাশক ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে জমির গুণগত ক্ষতি হয় এবং উর্বরতা হ্রাস পায়; ১০) রাসায়নিক উপাদানে উৎপাদিত ফসলের ব্যবহার মানুষের শরীরে দুরারোগ্য ব্যাধির জন্ম দেয় এবং জিনগত ক্ষতি ঘটায়; ১১) উৎপাদনশীলতাবৃদ্ধির এই নীতি অনুসরণের ফলে বিদেশাগত উচ্চ ফলনশীল বীজ ও রাসায়নিক সারের সঙ্গেই আমদানি হচ্ছে জেনেটিক্যালি মডিফায়েড বীজ যা কৃষিজমি ও মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর বলে ইতিমধ্যেই প্রমাণিত এবং বহু দেশে নিষিদ্ধ। এঁরা বলেন, ১) ভারতের মতো বর্ষার জলের উপরে নির্ভরশীল দেশের পক্ষে অল্প জলে চাষযোগ্য দেশীয় বীজই উৎকৃষ্ট; ২) কৃষিক্ষেত্রে বিদেশি প্রযুক্তির বদলে এদেশের পক্ষে উপযোগী শ্রমনিবিড় প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করা উচিত; ৩) কৃষিজ উৎপাদন ও গবাদি পশুকেন্দ্রিক দেশীয় চাষাবাদের উন্নততর পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। এঁরা উল্লেখ করেন যে, সবুজ বিপ্লবজাতীয় নীতি প্রয়োগের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ ও সেচের জল পেতে নদীতে বাঁধ দেওয়ার ফলে গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতির বিশেষ উপকার হয়নি। বরং, ক্ষতি হয়েছে। এক, বহু মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন, চাষাবাদের জমি হারিয়েছেন, বিকল্প পেশা খুঁজে না পেয়ে বেকার হয়ে গেছেন। দুই, হালের বেশিরভাগ বন্যাই ঘটে বাঁধ ইত্যাদির দরুণ নদীর গতি রুদ্ধ হওয়ার কারণে।

উপরের আলোচনা থেকে যে ভাবটা বেরিয়ে আসে তা হল যে-দেশে কৃষিকাজ একটা বড় অংশের মানুষের জীবিকা এবং জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান গুরুত্বপূর্ণ সে-দেশে একটি সুস্পষ্ট কৃষিনীতি থাকা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত, ভারতে দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ আজও গ্রামাঞ্চলে বাস করেন। ভারতের ৪৭ শতাংশ মানুষের জীবিকা কৃষিকর্ম। জাতীয় আয়ের ১৭ শতাংশ আসে কৃষিক্ষেত্র থেকে। কৃষিজ উৎপাদনের ৬৬ শতাংশ কৃষিক্ষেত্রের ফসল এবং ৩৪ শতাংশ গবাদি পশু। সুতরাং, ভারতে দেশের উপযোগী একটি কৃষিনীতি থাকা অত্যন্ত জরুরি। দুর্ভাগ্যক্রমে, নতুন তথ্য, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের পক্ষে উপযোগী কোনও সার্বিক কৃষিনীতি যা গ্রামের মানুষ, সমাজ, কৃষিক্ষেত্র,

কৃষিকর্ম, গবাদি পশুপালন প্রভৃতিকে একটি সূত্রে বাঁধতে পারে ও কল্যাণকর উন্নয়ন ঘটাতে পারে তা ভারতে নেই। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী, কৃষিনীতি প্রণয়নের অধিকার কেন্দ্রের।